শামসুর রাহমান (স্মরণে)

তরুণ সান্যাল

বংলা ভাষার কবি শামসুর রাহমান ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় প্রয়াত হলেন। ঢাকায়। সপ্তাহ ধরে জ্ঞানশূন্য ছিলেন। ক্রমশ তাঁর নানা অঙ্গের মৃত্যু হতে থাকে। পরিশেষে পরিজনের সমর্থন মেলে শ্বাসগ্রহণ করার কৃত্রিম যন্ত্র শরীর থেকে সরিয়ে নেওয়ার। প্রবলভাবে জীবিত, উজ্জীবিত, সন্ত্রাসবিরোধী, সর্বভাবে শিষ্ট ও সুভদ্র, বাঙালি সত্তায় পুর্ণ অথচ আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত এক আদর্শ বিশ্ববাঙালি কবি শামসুর রাহমান শারীরিক বাঙ্ময়তা থেকে নীরব হলেও কবিতা ও নানা প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে সদাবাঙ্ময় হয়ে রইলেন। শামসুর রাহমানের মৃত্যু আমার নিজ প্রজন্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কবির মৃত্যু; কবি জন ডানের উক্তিটি তাই মনে রাখি, ফর হুম দি বেল টোলস; ইট টোলস ফর দি।

শামসুর রাহমান দেশভাগের পর যাঁরা পূর্ব বাংলায় কবি হয়ে উঠেছেন, স্বৈরতন্ত্র -ধর্মান্ধতা-মৌলবাদের ও একমাত্রিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধান। ওই বাংলা থেকে, পাক-বাধাকে পার হয়ে যে কবিদের কিছু রচনা এ বাংলায় পড়েছি শামসুর রাহমান তাঁদের মধ্যেও প্রধান। 'কবিতা' ও 'চতুরঙ্গ' এবং কখনও অন্য পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু। শামসুর রাহমান একটি আশ্চর্য পরীক্ষা প্রথমাবধি করেছেন। খোলামনে যে কোনও বিষয় নিয়েই কবিতা লিখেছেন। এবং এক পরাক্রান্ত স্বৈরতন্ত্রের এক মুঠো দানের প্রত্যাশা না করে, তাঁর নিজের ভাবনা মতো সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক নানা বিষয়ও স্বদেশ বিদেশের কবিতার অঙ্গীভূত করেছেন। তার মধ্যে বাংলা বর্ণমালাও আছে। আবার বন্দিশিবিরে বাস করার বেদনা-যন্ত্রণাও আছে। শব্দচয়নে ছিল লোকমুখের কথার সঙ্গে শিষ্ট কাব্য ভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে নিজ কাব্যভাষা রচনা। ছন্দোবদ্ধ রচনাই ছিল তাঁর প্রধান। লিখেছেন অধিকাংশ কবিতাই প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে। কিছু গদ্য ছন্দেও। শামসুর পাক-বাধা ভেঙে ফেলে আ-চর্যাপদ সুভাষ - সুকান্ত সবার রচনাই ঐতিহ্য মনে ভেবেছিলেন। স্বভাবতই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, সামাজিকতায় দায়বদ্ধ কবিতা লিখেছেন। বাংলাদেশের যে কোনও মানবিক সমস্যা তাঁর কবিতায় অন্তঃগ্রথিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ভারত বিভাগের পর, পূর্ববঙ্গে জাতিস্বাতন্ত্র্য ধর্ম না হয়ে ভাষাকে বাহন করে গড়ে উঠেছিল। তার পরিপূর্ণ রূপ একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জাতি, তাঁর ভূগোল, তার ভাষা—এসব কিছুকে রূপ দিতে-দিতে কবিতায়, বহু সাংস্কৃতিক ও দৈহিক ভীতিকে অগ্রাহ্য করে যে কবি বিকশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ যখন প্রায় সম্পূরকপ্রায় —আমরা তো স্বচ্ছন্দেই বাংলাদেশের জাতীয় কবি বলে তখন শামসুর রাহমানকে চিহ্নিত করতেই পারি। কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর সম্মানিত স্থানে রেখেই।

শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) কবিতা বিষয়ে পরিচয় হয় আমরা প্রথম—সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা" পত্রিকাটিতে। সম্ভবত ১৯৫৩ সালেই। সেই বইটি কি একুশের প্রথম কবিতার সংকলন? বাংলাদেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র হড়াইয়ের ঠিক আগেই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ -এ বাংলা একাডেমির প্রকাশিত 'আধুনিক কবিতা' বইটির সম্পাদক রফিকুল ইসলাম একটি ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্যক্তিক প্রতিভার ফল আমরা লক্ষ করি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকজন কবির মধ্যে। ...বাংলা কবিতার ত্রিশের ধারার সঙ্গে এই কবিদের ঐতিহ্যগত সম্পর্ক স্পষ্ট, তবে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় এঁদের মানস পরিমণ্ডল গঠতি। এ কবিদের অধিকাংশের পরিণত জীবনের শিক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধের বিকাশ পূর্ব বাংলায়। বিভাগ পূর্বকালের মুসলমান কবিদের মতো প্রতিবেশী সমাজের কবি-শিল্পীদের প্রাধান্য ও পীড়নে, প্রতিযোগিতা ও সংঘাতে এঁরা ক্লান্ত নন। শুরু থেকেই অসাম্প্রদায়িক আন্তর্জাতিক, যুদ্ধবিরোধী ও সমাজচেনার অধিকারী। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পাঠও লাভ করেছেন। বাংলা কবিতার প্রবহমান ঐতিহ্যে গভীরভাবে স্নাত ওই কবিরা কবিতার ধর্মে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত।'

রফিকুল ইসলামের ওই ভূমিকায় বাংলাদেশের বা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের তরুণ কদির 'ত্রিশের ধারার সঙ্গে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক স্পষ্ট' মূল্যায়ন অনুসরণে বলা যায়, বঙ্গ ভুবনের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যও ছিল একই। আমাদের তো মনে হয় না ত্রিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে কারও 'প্রাধান্য পীড়ন প্রতিযোগিতা ও সংঘাত' প্রভৃতির দিক দিয়ে কোনও ভূমিকা ছিল না 'মুসলমান' কবিদের বিষয়ে। সুখের কথা বিভাগ পরবর্তী দুই বাংলার কবিরা, তাঁদের রীতি ও কাব্য দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, ত্রিশ বা চল্লিশ দশকের অবিভক্ত কাব্যধারাকে সবাই গ্রহণ করেছেন বেশিকম, কেউই সাম্প্রদায়িকতা বা জাত্যান্ধতায় আক্রান্ত হননি। কমবেশি আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা। সমাজ বিষয়েও ছিলেন মনস্ক ও বিশ্বশান্তির পক্ষেও ছিলেন নানা আন্দোলনে যুক্ত। ত্রিশের দশকের আধুনিক কাব্যাদর্শ প্রকাশ্য বা গোপন দ্বিজাতিতত্বের ছিল বিরোধী। আমরা খুশি হই জেনে যে, অভিভক্ত বাংলার ওই দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্যপ্রকরণ সব কিছুই শামসুর রাহমান আত্মস্থ করে দ্বিজাতিতত্তব অনুসারী সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের কবি না হয়ে 'বাংলা'র কবি হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববাংলার।

আসলে বাঙালি কেন, সব দেশের বিশিষ্ট কবিরা নানা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংঘাতকে নিয়েই কবিতার চর্চা

করেন। আমরা তো মনে হয় বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের কবিরা সমাজসত্য ঠিক ধরছেন না; নাকি সত্য কথা লিখতে সাহসী হচ্ছেন না, কোনও সেনসারের অদৃশ্য অস্তিত্বের ফলে। বাংলাদেশের কবিদের কাছে বিশেষভাবে শামসুর রাহমানের কাছে সেই সাহসের দীক্ষা নিতে হয়। সাধারণ দর্শক, পাঠক, এমনকী তাত্ত্বিক অধ্যাপক, সবারই যে বচন ও রচনা দেখি সমস্তটাই তার তাৎক্ষণিক সমাজে মতবিনিময়ের বাঙ্ময়তা। মানুষের এই বহিরঙ্গের ভুবনে আছে শিষ্টসমাজ। আছে রাজনৈতিকসমাজও। বহিরঙ্গে কবি-চিত্রকর-ভাস্কর- ঔপন্যাসিক সকলকেই রাজনৈতিকসমাজ দিয়ে ছোঁয়া যায়। ব্যক্তি, শ্রেণি, গোষ্ঠী প্রভৃতির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্রে ক্ষমতা পাওয়াই রাজনীতির বিষয়। ওই ব্যক্তি, শ্রেণি ইত্যাদি চায় এমন শিষ্টসমাজকে যেখানে পরস্পরের সম্পর্কই মনবিক ক্ষমতা—আপনার তাঁবে রাখতে। শিষ্টসমাজের মানুষজনকে নানা উপায়ে দলবদ্ধ করে স্বার্থরক্ষাই খোলাহ চোখে গণতন্ত্র। প্রয়োজনে শস্ত্রপাণি বাহিনী দিয়েও ওই শিষ্ট সমাজ বা সুশীলসমাজের কণ্ঠরোধ করা যায়। শিল্পীদের সংযোগ ওই সুশীলসমাজের সঙ্গে, ওই সুশীলসমাজের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে তো সমাজকাঠামো পরিবর্তনে দেরি হয় না। রাজনীতির মুষ্ঠ্যাঘাত দিয়ে সুশীলসমাজের কাঁঠালটি না পাকালেই হল। শিষ্টসমাজ ও রাজনৈতিকসমাজের দ্বন্দ্ব শামসুর রাহমানে বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

সৃষ্টিশীল শিল্পীর এক গভীর অন্তর্গত বিশ্ব আছে। বহু প্রত্ন অনুভবও তার নির্জ্ঞানে ঘুমিয়েও থাকে। বহু পুরাকথা প্রত্নমহা কথাও সেখানে বহমান। কবির কাছে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ডায়ালেকটিকস শব্দকে বহন করে কবিতা সৃষ্টিতে। শব্দেরও আছে ঐতিহ্য, আছে শারীর কাঠামো, চলতি সমাজে বহু ঘাত-প্রতিঘাতে তারও কিছু বদল হয়। প্রতিটি জনজাতির শব্দ সংস্থাপন করার তাগিদে আছে অজস্র শ্রমভিত্তিক কাজ। সেই শব্দপুঞ্জের মিশন ঘটানোর কাজের বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার, শব্দ গ্রন্থনার, কথনের উচ্চারণের, বাচনের ছন্দ গড়ে ওঠে। ওই অন্তরঙ্গ ভুবন, তার দীর্ঘ ও প্রত্ন—যৌথ নির্জ্ঞান তার ছন্দ, কোনও রাজশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, অতিশ্রেণিমান্যতা ভুলিয়ে দিতে পারে না। কবি বাইরের ও ভেতরের বিশ্বকে শব্দ দিয়ে মেলান। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার সোনার কাঠির ছোঁয়া কবির লেখা কবিতা হয়ে ওঠে।

এত কথা আমাদের বলার প্রয়োজন ছিল না। শামসুর রাহমানের বহু পীড়নে যখন অন্তর নির্জ্ঞান ভেঙে দেবার চেষ্টা বলছে, বাইরের সশস্ত্র চাপ এসে পড়ছে জীবনযাপনে, আসছে বন্দিদশাও, তখন অবশ্যই তাঁর পক্ষে পদ্য-লিখিয়ে হয়ে রাষ্ট্রের কেস্টবিস্টুদের সঙ্গে গলা মেলানো সম্ভব ছিল। কবি শামসুর রাহমান বাঙালি সৃষ্টিশীল ঐতিহ্য, তার মহাকথা, আঞ্চলিক কাহিনি, তার মধ্যযুগ, লোকস্মৃতি সবই আত্মস্থ করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের বহু পুরাকাহিনিও তাঁর আপন ঐতিহ্যের ছিল অন্তর্গত। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পুরাকথার বহু চরিত্র তাঁর কবিতায় এসেছে। ছিলেন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তো বটেই। শামসুরের কবি হবার উপকরণ ছিল মেলাই। বিশ্বকবিদের স্বধর্মী হওয়াটাই ছিল তাঁর ধর্ম। হয়েওছিলেন তাই। শিষ্টসমাজের শ্রেষ্ঠ কবি বিকলাঙ্গ রাজনীতিকসমাজকে ভেঙে নতুন মানবিকসমাজ গড়ার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়েছিলাম প্রথম। তখনকার বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত বহু তরুণের সঙ্গী হয়ে ঢাকা-ময়মন্‌সিংহ-যশোর প্রভৃতি জায়গায়। 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকাটি' দৈনিক বাংলা' নামে তখন প্রকাশিত হচ্ছে। বোধহয় কবি হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সম্পাদক। শামসুর রাহমান ছিলনে তাঁর সহযোগী। হাসান হাফিজুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনিই 'দৈনিক বংলা'র সম্পাদক হন। সেই শামসুর রাহমানের সঙ্গে প্রথম দেখা আমার। শান্ত স্নিগ্ধ মানুষটি। এত বড় যে লড়াইটা হয়ে গেল, সে সব নিয়ে কিছু কথা হল। বংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের মাটি ছাড়েননি। 'বন্দী শিবির থেকে' লেখা কবিতাগুলি আমরা তখন পড়েছি। পড়ছি?

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অমর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।

এই স্বাধীনতা ঠেকাবার জন্য কতই আক্রমণ, 'খান্ডবদাহন'। আর স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল চাষি মজুর ছাত্রের যেমন তেমনই পরিবার বাবা মা ছেলে মেয়ে সবারই। তা হবে 'বয়সী বটে ঝিলিমিলি পাতা, যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।' বাংলাদেশে ওই অর্জিত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যখন নানা প্রচেষ্টা হয়েছে, শামসুর রাহমান মুক্তি যুদ্ধের ওই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ফিরে পাবার জন্য আমৃত্যু লিখেছেন, সামাজিক অন্যবিধ ভূমিকা নিয়েছেন।

ওই একই সময়ে দেখা হয়েছিল আল মাহমুদের সঙ্গে, 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার অফিসে। আল মাহমুদ তখন ছিলেন অনেকখানি বাঁ-দিকের। বোধহয় শাহজাহান সিরাজের সঙ্গে, জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে। মনে পড়ছে, শামসুর

রাহমান মৃদু মন্তব্য করেছেন : 'এত সকাল সকাল সবাই ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে!' আল মাহমুদ কলকাতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোকযাত্রায় আমাদের সঙ্গে হেঁটেছেন। মাত্র ক'মাস পরেই বাংলাদেশের মাটিতে এমন ভাগাভাগি হয়ে গেল? আমার মনে হয়েছিল ওই সময় থেকেই শামসুর রাহমান জাতীয় সর্ববিধ প্রশ্নে হাতে-গরম কিছু চাইছেন না। প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত মিলে, বহু উত্থান পতনের সম্ভাবনাকে ধরে নিয়েই নানা খণ্ডে ভাগ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের মানুষজনকে অখণ্ড বাঙালিতে উজ্জীবিত দেখতে চেয়েছেন। যাঁরা পরবর্তীকালে 'ইসলামি' বাংলা গড়তে চেয়েছেন, ১৯৭১ সালেই বাঙালিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করেও বলির প্রতীকের মধ্যে আছে তাঁরা চোখে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ মধ্যযুগীয় ভারতীয় ও বাঙালি মহাকথার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা উপলব্ধি। দেশবাসীকে বাঙালি না ভেবে বাংলাদেশি মনে করেছেন যাঁরা, তাঁদের পক্ষে তো কোনও কথা বলেনইনি। বলেছেন:

আমি এমন এক তরুণের কথা জানতাম...
অপেক্ষা করত সে দিনের জন্যে,
যে দিন তার কবিতা হবে মৌলানা ভাসানী
এবং শেখ মুজিবের সূর্যমুখী ভাষণের মতো।
(আমার কোনও তাড়া নেই)

শামসুর এই দীর্ঘ অপেক্ষায় থেকেছেন, যেন মদন বাউলের মতো :

নিঠুর গরজি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে
ফুল ফোটাবি বাস ছোটাবি সবুর বিহনে
দ্যাখ আমার যেমন গুরুসাঁই
ফুল লোটাচ্ছে তাড়াহুড়ো নাই।'
(মদন বাউল)

এই তাড়াহুড়াই কারুকে করে তোলে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, অসৎ—আমার মনে হয়েছে শামসুর রাহমান কোনওভাবেই জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার একটি শর্তও বাতিল করেননি। বরং অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রবহমান ছিল তাঁর অন্তর বাঙালিত্ব। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমির আমন্ত্রণে কাজী নজরুলের ওপর বলার জন্য আমন্ত্রিত হই। আবার নতুন করে সাক্ষাৎ হল। অনেক সমস্যা তখন বিশ্ব জুড়ে। ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণ তখন অতি তীব্র। দক্ষিণ আমেরিকায় চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে তারা। রাষ্ট্রপতি আলেন্দে খুন হয়েছেন গণতন্ত্র বাঁচাতে। ফরাসি দেশের কবি, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত লুই আরাগাঁকে সম্বোধন করে শামসুর বলেছিলেন:

'আমার চোখে ইদানিং চালশে
এবং আমার নৌকো নোঙরবিহীন, তবু দেখি কম্পমান
একটি মাস্তুল দূরে, কেমন সোনালি'...
আরোগাঁ তবুও জ্বলে গ্রীষ্মে কি শীতে
আমাদের স্বপ্ন জ্বলে খনি-শ্রমিকের বাড়ির মতন
স্বপ্ন আমাদের।
(আরাগাঁ তোমার কাছে)

ওই চুয়াত্তর সালে বহু বহু সংকট দেখা দিয়েছে বাংলাদেশে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দু'টি মেয়ে বাদে বঙ্গবন্ধু মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। ওই বছরেরই সাতই নভেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লড়ায়ের লিজেন্ডারি চার নেতাও তাজউদ্দীনসহ। ওই সময়ের পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশেও যাওয়া হয়নি। ১৯৮৯ সালে এক ছাত্রের বাবার আমন্ত্রণে যাই। সেই ছাত্রের বাবা ছিলেন বাংলাদেশের বৈদেশিক মন্ত্রকের বেশ পদস্থ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিদ্বান রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও কবি ডক্টর আলী আহসানের। লড়াইয়ের সময় কলকাতায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যু হয় ওই সময়। আলী আহসান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত শোকসভায় চমৎকার বলেছিলেন। সেই সভায় শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে এক ধরনের মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ উদ্ভবের পর জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য হয়েছিলেন। ওই প্রথম তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, আলাওলের পদ্মাবতী বইটি প্রথম সংস্করণের শেষ কপিটিও আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই ১৯৮৯ সালে তাঁর বিশেষ পরিচিত বৈদেশিক মন্ত্রকের পদস্থ ব্যক্তির কাছে আমার উপস্থিতির কথা শুনে আমাকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ করেন। আবার ওই সময় শামসুর রাহমান, মফিদুল হক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ড. আলী আহসানের অফিসে যেতে প্রবলভাবে নিষেধ করলেন তাঁরা। তখন এরশাদ-জমানা। এরশাদও নাকি কবি ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান বাংলা দৈনিক এরশাদের ওপরে একটি ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করেছিল। তাঁর পরিচয়ে ছিল কবিও। এরশাদ কবি সম্মেলন ডাকতেন দু'বাংলার বহু কবিকে আমন্ত্রণ করে। ঢাকাতে না গেলে জানতেও পারতাম না পশ্চিমবঙ্গের বেশ ক'জন বিশিষ্ট কবি তাঁর আহূত ওই সম্মেলনে গিয়েছিলেন। শামসুর রাহমান এমন একজনের নাম করলেন, শুনে লজ্জা পেলাম। কোনও ভাবেই বাংলাদেশের লেখক, বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভট নেতাদের কাছে আত্মবিক্রয়,

বড় পদ্য প্রভৃতির দক্ষিণার সমালোচক ছিলনে। ছিলেন এ বাংলার বাক্ ঘরানার মানুষজন বিষয়েও।

যাইহোক গৃহস্বামীর আগ্রহে ড. আহসানের অফিসে গেলাম। তিনি সাহিত্য - সংস্কৃতি নিয়েই কথা বললেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন কোনও এক ব্যক্তির সঙ্গে। যিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিদ্বান, ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণকারী কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ছিলেন প্রতিপক্ষ। তিনি মানুষের পরিচয় ধর্মমতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে তাঁর কাছে ছিলেন হিন্দু কবি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের মৌল অন্তর্গত মন হিন্দু মন। আমি বলি ধর্মমত নয়, বড় পরিচয় ঘটে মানুষের মানুষ বলে, সৃষ্টিশীল মানুষ। উনি আমাকে উপনিষদ - গীতা- চণ্ডীতে বাঁধতে চান। আমি বলি ধর্মমত আলোচনায় গীতা-কোরাণ-বাইবেল আলোচনা হয়, কিন্তু মানবধর্ম নিয়ে কথা বললে, বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের কথা, গ্রিগ নাট্যকারদের কথা, দান্তে, শেক্সপীয়র, গ্যায়টের কথা। ভদ্রলোকের মুখে সামান্য দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, পাজামা পাঞ্জামি পরণে। বললেন, 'আপনি তো শামসুর রাহমানদের মতো বলেন। তবে, সে যোগ করে গ্রিক-রোমান-এপিকও। এসব বলে নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। দেখুন ওঁদের একজনও পবিত্র ধর্ম ইসলামের কেউ নন। এই পবিত্র দেশে ওসব চলবে না। 'ডা. আহসন বিব্রতবোধ করেন। সন্দেহ -কেক-কফি এল। তারপর উনি নিজেই আমাকে ড্রাইভ করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। অনুরোধ করলেন আগামী কবি সম্মেলনে উপস্থিত হতে। বললাম, সম্ভব হবে না। শামসুর রাহমান আপন চরিত্রমাফিকই পরবর্তীকালে 'ঘাতক দালাল নির্মূল' কমিটি সভাপতি হয়েছিলেন।

১৯৯৪ সালে সূর্য সেন জন্মশতবার্ষিকীতে চট্টগ্রামে আমন্ত্রিত হই। সে সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। প্রচার চলছিল সন্ত্রাসী সূর্য সেনের বিরুদ্ধে ঘোমটা দেওয়া সরকারি দলভুক্তদের পক্ষে থেকেই। ঢাকা পৌঁছতে না পৌঁছতে শহিদস্মারক অঞ্চলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ডাকা সভায় পৌঁছলাম। দেখা হল বহু বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। যেমন শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান। তার দু'দিন পর চট্টগ্রামেরও একটি আলোচনাচক্রেও শামসুর রাহমানের সঙ্গে দেখা হল। লক্ষ করলাম শরীর অনেক ভেঙেছে। ভাষণের তুলনায় কবিতা পড়তেই তিনি পছন্দ করেন। ১৯৯৬ সালে বাংলোদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা ক'বার আমন্ত্রণ করে মুদ্রিতও করি। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানগুলিতে আমন্ত্রিত এ বাংলার একাধিক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর নরম প্রতিবাদ শুনলাম।

এই যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ ঘটনা, সে বিষয়ে গভীরভাবে মনস্ক ছিলেন তিনি। এমনকী বহুবার যিনি কটুকথায় তাঁর বিষয়ে লিখেছেন, এমন এক লেখিকার সঙ্গে উপস্থিত থেকে আমার সাক্ষাৎও ঘটিয়ে দেন। তিনি ওই লেখিকার নিরাপত্তার পক্ষে তখন সোচ্চারও ছিলেন। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ডাকা সভা সমিতি, গণতান্ত্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা উদীচীর একাধিক সভায় গিয়ে তিনি মৌলবাদীদের নানা আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এমন একজন চলমান ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনীতির কর্মকাণ্ডকে আত্মস্থ করেছেন যখন, তখন সে সব কবিতার মধ্যে স্বতঃই চলে এসেছে। কিন্তু এসেছে প্রতীক, চিত্রকল্প এবং মহাকথার বাহন হয়ে। প্রত্যক্ষ দলীয় ঘোষণা না হয়ে।

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ট কবিতা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'কবিতা লেখার সময়, কোনও এক রহস্যময় কারণে, আমি শুনতে পাই চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনও নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, কিছু পেয়ারা গাছ, বাগানঘেরা একতলা বাড়ি, একটি মুখচ্ছবি, তুঁত গাছে ডালের কম্পন, ধিকিয়ে চলা ঘোড়ার গাড়ি, ঘুমন্ত সহিস ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে বারবার।' নির্জ্ঞানের যে প্রতীকগুলি ঘুমের জাগরণে তাঁকে ডেকেছে, তিনি যা দেখেছেন সেই মনোলোকে, আমাদের মনে হয়, সবই তিনি ওই প্রতীকগুলি কাব্যবিন্যাসে ধরেছেন। দেশি-বিদেশি শাসক-শোষকের চাবুকের হিস-হিস থেকে ধীরগতিতে চলা সময় সরণিতে দেশের সামর্থ—সবই তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছেন। লিখছেন, তিনি : 'আমি তো জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে চাই। কুড়িয়ে আনতে চাই পাতালের কালি, তার সকল রহস্যময়তা। যে মানুষ টানেলের বাসিন্দা, যেমন মানুষ দুঃখিত, একাকী— সে যেমন আমার সহচর, তেমনই আমি হাঁটি সে সময় মানুষের ভিড়ে, যারা ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে তৈরি করে মিছিল।' ওই ভবিষ্যৎ রচনার দিশারী ছিলেন তিনি।

আত্মপরিচয়ে লিখেছেন:

আমার মাতামহের টাইপরাইটার আবৃত্তি করেছেন
কোরানের আয়াত, আওড়াচ্ছেন ফার্সি বয়েত। আমার স্বপ্নের দ্বীপে তিনি প্রস্পেরো
প্রজ্ঞাবান আর ঐন্দ্রজালিক, যিনি এই মাত্র ভেঙে ফেলেছেন তাঁর দণ্ড , সমুদ্রে ডুবিয়ে এসেছেন তাঁর পুঁথি। তার কি -বোর্ড থেকে
অবিরাম ঝরছে জুঁই-চামেলির মতো শব্দমালা,
যে আমি ছিলাম প্রেরণারহিত, বন্ধ্যাগুহায় কুঁকড়ে পড়ে থাকা সে আমি তর্জমা করে চলেছি টাইপরাইটার নিঃসৃত শিল্পিত শব্দমালা কী মোহন ভূতগ্রস্থতায়। কখনও আস্তে-সুস্থে, কখনও - বা খুব দ্রুত, যতক্ষণ না ক্লান্তি এসে ভর করে চলমান কলমের ডগায়।'
(আমার মাতামহের টাইপরাইটার)

ঐতিহ্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে আপনার শিল্পিত শব্দমালা সাজিয়ে চলমান কলমটি তিনি চিরকালের জন্য দিয়ে যান উত্তরসুরিদের হাতে সতেরোই আগস্ট ২০০৬ সালের সন্ধ্যায়।